ইতিহাস প্রবন্ধমালা

ISSN-2074-8663
(Peer-Reviewed Journal)
বর্ষ ২০, সংখ্যা ১৮, ফাল্গুন ১৪২৯/ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রি.

সম্পাদক
অধ্যাপক ড. সামিনা সুলতানা

ইতিহাস একাডেমি ঢাকা

ইতিহাস প্রবন্ধমালা
ISSN-2074-8663
(Peer-Reviewed Journal)
বর্ষ ২০, সংখ্যা ১৮, ফাল্গুন ১৪২৯/ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রি.

সম্পাদনা পরিষদ
অধ্যাপক ড. শরীফ উদ্দিন আহমেদ
অধ্যাপক ড. এ কে এম শাহনাওয়াজ
অধ্যাপক ড. সামিনা সুলতানা
অধ্যাপক ড. নাজমা খান মজলিস
অধ্যাপক ড. মো. আতিয়ার রহমান
মো. রোকন-উদ-দৌলা
ড. সৈয়দা শায়লা তায়েফ

সহযোগী সম্পাদক
ড. মো. শাহিনুর রশীদ

সম্পাদনা সহযোগী
ড. ফজিলাতুন নেছা
ড. মো. কামরুজ্জামান
মো. হাসাইবুর রহমান
আয়শা জাহান
আবু সাঈদ

প্রচ্ছদ : ড. মো. শাহিনুর রশীদ
[প্রচ্ছদে ব্যবহৃত চিত্র: পাথরের রক্ষাকবচ– উয়ারী-বটেশ্বরে প্রাপ্ত উপমহাদেশে মৌর্যযুগের একমাত্র নিদর্শন। চিত্র: অধ্যাপক ড. সুফি মোস্তাফিজুর রহমান।]

প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
প্রকাশক : ইতিহাস একাডেমি ঢাকা
৫/৭ গজনভী রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা, বাংলাদেশ।
E-mail: academyitihas@gmail.com
Website: www.itihasacademybd.com

মুদ্রণ : শাইনিং প্রিন্টার্স, ২৭৮/৩/এ, কাঁটাবন, ঢাকা।
মূল্য : ৬০০.০০ টাকা

Itihas Prabandhamala (ISSN-2074-8663), Vol. 20, No. 18; edited by Dr. Samina Sultana and published by Itihas Academy Dhaka, 5/7 Gojnovi Road, Mohammadpur, Dhaka, Bangladesh. February 2023. Cover Design: Dr. Md. Shahinur Rashid, Price: 600.00 BDT

সূচিপত্র

মধ্যযুগ: ইতিহাসবিদ আবদুল করিম স্মৃতি পুরস্কার-২০২২

ড. মো. মিন্টু আলী বিশ্বাস : মাহীসন্তোষ মসজিদের প্রস্তর খোদাই শৈলীর বিশ্লেষণ ০৭

ঔপনিবেশিকযুগ: ইতিহাসবিদ কে এম মোহসীন স্মৃতি পুরস্কার-২০২২

মোহাম্মদ আব্দুস সালাম : ভারত ও বাংলা বিভক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে সিলেট গণভোট- লর্ড মাউন্টব্যাটেনের দায়বদ্ধতার স্বরূপ ২৫

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ: ইতিহাসবিদ এ এফ সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ স্মৃতি পুরস্কার- ২০২২

Nibedita Pramanik : An Exploration of Women's Role in the Liberation War of Bangladesh ৪৭

সংস্কৃতি: লোকবিদ আশ্‌রাফ সিদ্দিকী স্মৃতি পুরস্কার-২০২২

ড. মো. এরশাদুল হক : উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী পেশা ঘুটে কুড়ানি ও বারানি ৫৭

মো. মঈনুল হাসান : যমুনা গণহত্যা: একটি পর্যালোচনা ৬৫

ড. মোঃ মোরশেদুল আলম : আগরতলা মামলা ও বাংলাদেশের অভ্যুদয় ৭৯

মহ. সাইয়াকুল সেখ : ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ ও কলকাতার 'যুগান্তর' পত্রিকা ৯৫

মো: রিয়াদ হোসেন : মুক্তিযুদ্ধকালীন বটিয়াঘাটা উপজেলার মানবতাবিরোধী অপরাধ: প্রেক্ষিত ফুলতলা-দেবীতলা-বাদামতলা গণহত্যা ১০৯

তাসনোভা জেরিন উলফাত : ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলায় গণহত্যা ও শহিদ পরিবারের জীবন সংগ্রাম ১১৯

ড. মোঃ আরিফুর রহমান : পবা উপজেলায় একাত্তরে জনযুদ্ধের বৈশিষ্ট্য ১৩৭

সুলতানা সুকন্যা বাশার : 'জয়বাংলা' পত্রিকার কার্টুনচিত্রে মুক্তিযুদ্ধের প্রতিচ্ছবি ১৫৫

বিশ্বজিৎ ঘোড়ুই : পশ্চিমবঙ্গের তাঁত শিল্পে টাঙ্গাইল ও জামদানি উদ্বাস্তু তাঁতিদের জীবন সংগ্রাম: ১৯৪৭-১৯৭৭ ১৬৩

শহিদুল হাসান : *ফাতেমার সুরতনামা*: পাণ্ডুলিপি পাঠ ও বাংলা লিখনরীতি ১৭৩

হোসনে আরা কামালী : মাহমুদুল হকের *কালোবরফ*: উন্মুল ব্যক্তি ও স্বদেশের সহজিয়া ১৮৯

পাভেল স্টালিন বর্মন : ভাটিঅঞ্চলের লোকসমাজ ও লোকসংস্কৃতি: একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা ১৯৯

তন্ময় মালাকার : ঔপনিবেশিক বাংলায় পুলিশি নির্যাতনে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি ২১৫

মো. কামরুজ্জামান : বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইন পরিষদ, সাংবিধানিক সংস্কার ও অগ্রগতি (১৮৬১-১৯৩৫): একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা ২২১

মো. আজিজুর রহমান নয়ন : তিতুমীরের মতাদর্শের সাফল্য ও ব্যর্থতার একটি পর্যালোচনা ২৩৫

ড. পলাশ মণ্ডল : সুভাষচন্দ্র ও সুভাষবাদ- অনিল রায়ের দৃষ্টিতে ২৪৩

ড. ইমতিয়াযুল আলম মাহফুয : আল-কুরআনে প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান ২৫৩

ড. রওশন আরা আফরোজ : ব্রিটিশ আমলে বাংলায় নগরায়ণ (১৮৭২-১৯৪৭): একটি জনশুমারি ভিত্তিক পর্যালোচনা ২৬৭

ড. শ্যামল কান্তি দত্ত : *বিদ্রোহী*র রূপতত্ত্ব ২৮৩

বাবলু মল্লিক : বিংশ শতকে ঔপনিবেশিক বাংলার ধর্মীয়-সামাজিক আন্দোলন: স্বামী বেদানন্দ ও ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ ২৯৩

ড. কৃষ্ণ কুমার সরকার : কর্মকার জাতির ইতিহাস ৩০১

ড. তাসলিমা ইসলাম : শহর চট্টগ্রামের বিকাশ ধারা: মুঘল আমল ৩১১

ড. ত্রিদিব মণ্ডল : শিল্প ও বাণিজ্য সংকটে দেশভাগের প্রভাব: প্রসঙ্গ পশ্চিমবঙ্গের পাটশিল্প ৩২১

ড. হাসনারা খাতুন : মুসলমান সম্পাদিত বাংলা সাময়িক পত্রিকা: ধর্মচর্চা এবং সম্প্রীতি প্রচারের নানাদিক ৩৩১

সানজিদা মুস্তাফিজ : শিশুশ্রম নিরসনে বাংলাদেশের আইনগত প্রচেষ্টা: একটি পর্যালোচনা ৩৪১

রাণু মিস্ত্রী : এক অনন্য বিপ্লবী মানবতাবাদী: ফুলরেণু গুহ ৩৬৫

ড. সানিয়া সিতারা : শামসুন নাহার মাহমুদ: বাংলায় নারী ক্ষমতায়নের অগ্রদূত ৩৭৫

মাহফুজা হিলালী : নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণী: বঙ্গীয় নারীপ্রগতির পথিকৃৎ ৪১১

ড. দেবনারায়ণ মোদক : 'বৃহত্তর কুষ্টিয়া'-র অতীত ও বর্তমান: 'অবিভক্ত নদিয়া'-র উত্তরাধিকার ও দেশভাগ-উত্তর প্রশাসনিক সংস্কার ৪২৩

ড. সুব্রত নন্দী : কোলকাতা শহরে উদ্বাস্তু নারীদের পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থান: একটি পর্যালোচনা (১৯৪৭-১৯৭১) ৪৩১

তপন কুমার মন্ডল : কুর'আন ও হাদিসের আলোয় উনিশ-বিশ শতকে ইসলামি বাংলা সাহিত্য চর্চা ৪৩৯

দীপংকর শীল : চা বাগানের ভাষা ও শিক্ষা পরিস্থিতি: প্রেক্ষিত উরাং জাতিসত্তা ৪৪৭

ইদ্রিস আলী : সুন্দরবন অঞ্চলের নৃগোষ্ঠী মুণ্ডা সম্প্রদায়ের খাদ্য সংস্কৃতি ৪৫৭
মুহম্মদ সায়েদুর রহমান তালুকদার : বাংলাদেশে হাওরাঞ্চলের নদনদী ৪৬৭
Dr. Sanjay Prasad : Contribution of Marwaris in the Growth of Burrabazar in Calcutta during the Second Half of the Nineteenth Century ৪৭৯
Manab Bhattacharya : Art History of Ancient Bengal and Nalinikanta Bhattasali: A Historiographical Study ৪৮৯
Umme Atia Khatun : Politicized Transgender in *The Ministry of Utmost Happiness*: A Psycho-Social Study ৪৯৭
Dr. Swati Maitra : Down the Memory Lane- the Journey of Nikhil Banga Prathamik Sikshak Samiti from 1935 to 1977 ৫০৭
Md. Kasim Uddin : The Low Performance of Students in English at a Secondary School: A case study of Tapur Char High School, Kurigram ৫২১
Utpal Biswas : Patron of Temples in a New Perspective: Case Studies of Rāḍha Bengal (16th to 19th Centuries) ৫৩৩
Dr. Niranjan Jaladas : Roots of the Marine Fishing Mechanism Developed in Indian Sundarbans ৫৫১
Rupa Ghosh : Bhumij In Assam ৫৬৫

গ্রন্থ-পর্যালোচনা

সঞ্জীব বিশ্বাস : *দাঙ্গা থেকে দেশভাগ: 'হিন্দু' বাঙালির প্রতিক্রিয়া* ৫৭৭
আয়শা জাহান : *নথিতে যশোরের জমিদারি (খ্রিষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দি)* ৫৮১

ISSN-2074-8663
ইতিহাস প্রবন্ধমালা
বর্ষ ২০, সংখ্যা ১৮, ফেব্রুয়ারি ২০২৩

মুসলমান সম্পাদিত বাংলা সাময়িক পত্রিকা: ধর্মচর্চা এবং সম্প্রীতি প্রচারের নানাদিক

ড. হাসনারা খাতুন*

বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার কালপর্বে সাময়িক পত্রিকার গুরুত্ব সর্বজনবিদিত। এই পত্রিকাগুলি সমাজ-রাজনীতি এবং ধর্মীয় চর্চার ধারায় নিজেদের মেলে ধরতে পেরেছিল। তাই সময়কে জানতে বা বুঝতে পত্রিকাগুলি আকর হিসেবে আজও সমাদৃত। বাংলার মুসলমান সমাজের কথা আলাদা আলোচনার দাবি রাখে। সেক্ষেত্রে উনিশ-বিশ শতকের মুসলমান সমাজের হাল-হকিকত জানতে এই সময়ে প্রকাশিত মুসলমান সম্পাদিত পত্রিকাগুলি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে উনিশ এবং বিশ শতকের কালপর্বে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের নানা উত্থান-পতন ধরা পড়েছে এই পত্রিকাগুলির পাতায়। মুসলমান সম্পাদিত এই পত্রিকাগুলিতে মুসলমান সমাজের ধর্মচর্চার নানাদিক এবং সম্প্রীতি প্রচারের উদ্যোগকে বিশ্লেষণ করলে ঐ সময় সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। এই আলোচনায় সেই দিকটি দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

সূচক-শব্দ: পত্রিকা, মুসলমান সমাজ, ধর্মচর্চা, সম্প্রীতি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরু থেকেই ভারতবর্ষের রাজনীতিতে মুঘল আধিপত্যের অবসান ঘটে। সর্বভারতীয় মুঘল সাম্রাজ্যের ক্ষীণ পরিণতি এবং আঞ্চলিক শক্তিগুলির ক্রমান্বয়ে উত্থান, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পথ প্রসারিত করেছিল। পাশাপাশি অর্থনৈতিক ভিত্তি পরিবর্তনের পথটিও সুগম হচ্ছিল দ্রুত গতিতে। সামন্ততান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার 'সিস্টেম' চলে যাচ্ছিল বণিকতন্ত্রের হাতে। এমনকি দেশীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ইউরোপীয় কোম্পানিগুলিও নিজেদের ভাগ্যান্বেষণের ক্ষেত্রে উপমহাদেশের বাজারকে ধরতে চেয়েছিল। এই বাজারজাত চাহিদাকে কেন্দ্র করেই উপমহাদেশের শাসনযন্ত্রে কোম্পানির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। কোম্পানির শাসনকালে পুঁজি কেন্দ্রিক মুনাফা লাভের দিকটি প্রধান হলেও শিক্ষা-সাংস্কৃতিক জগতের ক্ষেত্রটি প্রভাবিত হয়েছিল নানা ভাবে। সেই প্রভাব এদেশীয় সামগ্রিক জীবনচর্যার অন্তরঙ্গ এবং বহিরঙ্গে বহুমুখী বিস্তার ঘটিয়েছিল। সেক্ষেত্রে শিক্ষার মাধ্যম এবং বিষয় সম্পর্কিত পরিবর্তনটি আলাদা আলোচনার দাবি রাখে।

*সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উনিশ শতকের শুরু থেকেই পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন চর্চার মধ্য দিয়ে বাঙালি সমাজ নিজেদের ব্যাপ্তি এবং সমৃদ্ধির পথ তৈরি করতে শুরু করেছিল। সেই পথে সাহিত্যের বিস্তৃতি নতুন মাত্রা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল। গদ্যসাহিত্য, প্রবন্ধ সাহিত্য, খণ্ড কবিতা, গীতিকবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প ইত্যাদি হরেক কিসিমের সম্ভার নিয়ে বাংলা সাহিত্য শুরু করেছিল তার নতুন অধ্যায়। আর সেই অধ্যায়ের কান্ডারী হয়েছিল সাময়িক পত্রিকাগুলি। উনিশ শতকের শুরু থেকেই সাময়িক পত্রিকার প্রকাশ সাহিত্য চর্চার অন্যতম মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়।

উনিশ শতকের সামগ্রিক জীবনচর্যার প্রেক্ষিতটিকে বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি ফাঁক-ফোকর খুব সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। যেমন, বাংলার মুসলমান সমাজ। অর্থনৈতিক এবং শিক্ষা-সাংস্কৃতিক দিক থেকে এই সমাজ অনেকটাই পিছিয়ে ছিল। বাঙালি হিন্দু সমাজের মধ্যে নতুন শিক্ষা এবং সমাজ ব্যবস্থা গ্রহণীয় হলেও মুসলমান সমাজ সেই পথের পথিক হতে পারেন নি। অর্থনৈতিক এবং শিক্ষাগত দিক থেকে পিছিয়ে থাকার দরুন সাময়িক পত্রিকা প্রকাশের ধারাতেও মুসলমান সমাজের পক্ষ থেকে বিশেষ অগ্রগতি লক্ষিত হয় না। আনিসুজ্জামান প্রণীত *'মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র'* বইতে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে মাত্র দুটি পত্রিকার ('সংবাদ সভারেজেন্দ্র' [১৮৩১] 'জগদ্দীপক ভাস্কর' [১৮৪৬]) নাম পাওয়া যায় যেগুলি মুসলমান সম্পাদক দ্বারা প্রকাশিত হয়েছিল। তবে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ভারতবর্ষের সামগ্রিক পরিস্থিতি ভিন্ন খাতে বইতে শুরু করে। সেই ধারায় বাঙালি মুসলমান সমাজের মধ্যেও উত্তরণের চাহিদা পরিলক্ষিত হয়। প্রথমত, প্রথম মহাবিদ্রোহের পর উপমহাদেশের শাসনভার (১৮৫৮) সরাসরি ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের হাতে চলে যায়। কোম্পানির শাসনের অবসান এবং সরাসরি ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের অধীনে আসার ফলে ভারতীয়দের মনে ইতিবাচক দিক তৈরি হয়েছিল। মুসলমান সমাজের পক্ষ থেকেও সেরকম ইঙ্গিত পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত, ওয়াহাবি ক্রিয়াকলাপকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশদের মনে মুসলমানদের প্রতি বিরূপ মনোভাব তো ছিলই, সেই সঙ্গে মুসলমানদের গুটিয়ে নেওয়ার মানসিকতাও মুসলমান সমাজের পক্ষে অন্ধকারাচ্ছন্নতার অন্যতম কারণ ছিল। ১৮৭০-এর পর থেকে সেই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার তাগিদ অনুভূত হতে থাকে। দ্বিতীয়ত, মুসলমান সমাজের আর্থিক পিছিয়ে পড়ার দিকটি শোধরাতে বেশ কিছু মুসলিম চিন্তাবিদ হাল ধরার চেষ্টা করেন। শিক্ষার অগ্রগতির পাশাপাশি সচেতনতার পাঠ নিয়ে তাঁরা মুসলমান সমাজের মধ্য থেকে জাগরণের পাঠ দিতে থাকেন। বেশ কিছু সভা-সমিতি তৈরি করে শিক্ষার প্রসারের চেষ্টা করেন। শিক্ষা এবং সরকারি চাকরির মধ্য দিয়েই মুসলমান সমাজের সার্বিক উন্নতির পথ তৈরি হবে বলেই তাঁদের এই প্রয়াস ছিল। সেই সূত্রেই পত্র-পত্রিকার জগতে বাঙালি মুসলমান সমাজের আগমন। উনিশ শতকের সত্তরের দশক থেকে সেই পত্রিকা প্রকাশের ধারায় মুসলমান সমাজের উপস্থিতি বেড়ে যায়। এই সমস্ত পত্রিকাগুলি প্রকাশের ক্ষেত্রে বিভিন্ন উদ্দেশ্য পরিলক্ষিত হয়। প্রথমত, এই কয়েকটি পত্রিকা সাময়িক কিছু ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রকাশিত হয়েছিল, ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর পত্রিকার আয়ু ফুরিয়ে যায়। আবার কিছু পত্রিকা মুসলমান সমাজের সাহিত্য প্রকাশের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। আবার সম্প্রীতি প্রকাশের উদ্দেশ্য নিয়েও কিছু পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। এক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দিকটিই আমাদের আলোচ্য বিষয়। আমাদের

আলোচনা বিশ শতকে প্রকাশিত পত্রিকাগুলিকে কেন্দ্র করে হলেও উনিশ শতকীয় প্রেক্ষাপটটিকে কেন্দ্র করেই সেই আলোচনার সূত্রপাত হবে। তাই উনিশ-বিশ শতকের সন্ধিক্ষণটিকে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

প্রথমত, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে হিন্দু জাতীয়তাবাদী ভাবধারার প্রকাশের ক্ষেত্রে মুসলমান বিরোধিতার দিকটি বেশি করে প্রকাশ্যে আনা হয়। সুলতানি বা মুঘল আমলকে বর্বরতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত হিসেবে সাহিত্যের পাতায় ঠাঁই দেওয়া হয়। আওরঙ্গজেবের চরিত্রকে কালিমালিপ্ত করে প্রকাশ করা হয়। মুসলমান সমাজের মধ্য থেকে এটা মেনে নেওয়া দুষ্কর হয়ে পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্রের *'রাজসিংহ'* উপন্যাস, নবীনচন্দ্র সেনের *'পলাশীর যুদ্ধ'* কাব্য ইত্যাদি রচনার বিষয় নিয়ে মুসলমান সমাজের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল। নিবন্ধের পরবর্তী অংশে পত্রিকায় প্রকাশিত এ সম্পর্কিত বিষয়ে নানা অভিযোগ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, মুসলমান সমাজের পক্ষ থেকে সার্বিক উন্নয়নের চাহিদাকে গুরুত্ব দিয়ে মুসলমান সমাজ চিন্তকগণ শাসক শ্রেণির কাছে তাদের জন্য বিশেষ সংরক্ষণের দাবি জানান। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে হান্টারের 'The Indian Mussalman' প্রকাশিত হলে মুসলমান সমাজের দিকটি ঔপনিবেশিক সরকারের দৃষ্টিগোচর হয়। যদিও সেখানে মুসলমান সমাজের প্রকৃত অবস্থা এবং চাহিদার দিকটি অনুপস্থিত ছিল। কিন্তু ঔপনিবেশিক সরকার মুসলমানদের জন্য 'বিশেষ সরকারি সাহায্যের' ঢোল পেটাতে শুরু করেন। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে নর্থব্রুকের প্রস্তাবে মুসলমানদের সরকারি সাহায্যের দাবিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ১৮৮২ ও ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে সেন্ট্রাল ন্যাশানাল মহামেডান অ্যাসোসিয়েশন সরকারের কাছে একাধিক স্মারক লিপি প্রেরণ করেন। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের এক সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে সরকারি ক্ষেত্রে অধস্তন পদে মনোনয়নের মাধ্যমে নিয়োগের নিয়ম জারির কথা উল্লেখ করা হয়।[২] ফলে, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন এবং তাকে ঘিরে স্বদেশী আন্দোলনের কালে হিন্দুদের বঞ্চিত হওয়ার অভিযোগটি স্পষ্ট আকার ধারণ করে। বলা বাহুল্য, হিন্দু সমাজের পক্ষ থেকে বিরোধিতার সুর বেজে ওঠে।

তৃতীয়ত, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে/প্রদেশে ঘটে যাওয়া দাঙ্গার ঘটনায় সেই সম্পর্ক আরও তলানিতে এসে ঠেকে। ১৮৭০-এর দশকে বেরিলিতে, ১৮৮০-এর দশকে আগ্রাতে, ১৮৯৬-তে টিটাগড়ে, ১৮৯৭-এ টালায়, ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে ঈশ্বরগঞ্জে, ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে কুমিল্লায় দাঙ্গার ঘটনা ঘটে।

চতুর্থত, উনিশ শতকের আশির দশক থেকে ভারতীয় তথা বাঙালি মুসলমানের সামনে প্যান-ইসলামের ভাবধারা বহুল প্রচারিত হতে থাকে। বিশ্বের সমস্ত মুসলমানের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কের আধারে তুরস্কের সুলতানের দূত জামাল উদ্দিন আফগানি (১৮৩৮-১৮৯৭) একসূত্রে বাঁধতে চেয়েছিলেন। যদিও এই বন্ধনের গূঢ় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল, তবে সাধারণ মুসলমান সমাজ তা উপলব্ধিতে অপারগ ছিলেন। যে কারণে সৌভ্রাতৃত্বের

---

[২]শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, *পলাশি থেকে পার্টিশান ও তারপর*, কলকাতা, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, ২০১৬, পৃ. ৩২১।

সরল প্রচারে আত্মহারা হয়ে আরবীয় সংযোগ সাধনের দিবাস্বপ্নে ভাসতে থাকেন।[৩] জাতীয়তাবাদী ভাবধারার আদর্শে যখন দেশমাতৃকার বন্দনার উদ্যোগে শুরু হল, তখন মুসলমান বিশ্বব্যাপী মুসলমানি সম্পর্ক স্থাপনের আশায় কালাতিপাত করছিলেন। তুরস্ক বা পশ্চিম এশিয়া বা আফ্রিকার মুসলমান অধ্যুষিত দেশগুলির ভালো-মন্দের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে তাঁরা ভ্রাতৃত্ব প্রকাশের তোড়জোর করছিলেন।

পঞ্চমত, উনিশ শতকের শেষের দিকে তৈরি হওয়া আত্মপরিচয়ের সংকট, বাঙালি মুসলমানের সামনে জাতিগত ও ধর্মীয় পরিচয়ের দ্বন্দ্ব তৈরি করেছিল। সেক্ষেত্রে ভাষা সমস্যা একটা বড় 'ইস্যু' হয়ে দাঁড়ায়। জাতিগত এবং ধর্মীয় পরিচায়ক ভাষা বাংলা ও আরবি এবং ভারতীয় মুসলমানদের অভিজাত ভাষা রূপে পরিগণিত উর্দু নিয়েই বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে তৈরি হয় দ্বন্দ্ব। তবে উনিশ শতকের শেষে এই বিরোধের সমাধান ঘটে বলেই ওয়াকিল আহমেদ তাঁর *'উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা'* বইতে জানিয়েছেন।[৪] বাঙালি মুসলমান বাঙালিত্বের পরিচয়কে প্রাধান্য দিয়ে বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চার মধ্য দিয়ে নিজেদের তুলে ধরতে শুরু করেছিলেন।

উপরোক্ত জটিল প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতেই মুসলমান সম্পাদিত পত্রিকাগুলির ধর্মচর্চা এবং সম্প্রীতি প্রচারের দিকটি আলোচনা করা হবে। উল্লেখ্য, পত্রিকাগুলিতে সম্প্রীতির প্রসঙ্গ যখন এসেছে, তখন বিরোধিতার প্রসঙ্গও ছিল। তবে এই বিরোধিতার মাত্রা ছিল বহুমুখী। ভারতীয় প্রেক্ষাপটে হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্বের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে খ্রিস্টান-মুসলমান, ইহুদি-মুসলমান, মুসলমান ধর্মালম্বীদের বিভিন্ন গোষ্ঠী যেমন হানাফি-কাদিয়ানি-আহমদি ইত্যাদি গোষ্ঠীর মধ্যেও বিরোধের প্রকাশ দেখা গেছে পত্রিকার পাতায়। তবে আমাদের এই আলোচনার ক্ষুদ্র পরিসরে হিন্দু-মুসলমান বিরোধের দিকটিই আলোচনায় আনা হবে। হিন্দু-মুসলমান বিরোধের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন 'ইস্যু' কার্যকর ছিল। তার মধ্যে অন্যতম হল, গো-রক্ষা সংক্রান্ত বিবাদ। গো-কোরবানি বা গো-মাংস ভক্ষণকে কেন্দ্র করে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে একাধিক দাঙ্গার ঘটনা ঘটেছে।[৫] গরুকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক হানাহানির যে ধারা উনিশ শতক থেকে শুরু হয়েছিল, বিশ শতক পেরিয়ে একুশ শতকে এসেও তার অবসান ঘটেনি। এমন জটিলতর সমস্যা নিয়ে মুসলমান পত্রিকাগুলিতে নানা আলোচনা-সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। স্বাভাবিক ভাবেই সমস্যা সমাধানের কলম

[৩] ওয়াকিল আহমেদ, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী ঢাকা, জুন ১৯৯৭, পৃ. ৪৮৫-৪৮৬।

[৪] ওয়াকিল আহমেদ, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮৬।

[৫] মুসলমানদের গো-কোরবানি বা গো-মাংস ভক্ষণকে কেন্দ্র করে উনিশ শতক থেকে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে বিভিন্ন অঞ্চলে দাঙ্গা শুরু হয়। প্রথমত, ১৮৭০ এর দশকে পাঞ্জাব, অযোধ্যা, রোহিলখণ্ড ইত্যাদি স্থানে গো-রক্ষিণী সমিতি তৈরি হয়। বিহার, বারাণসী, পূর্ব এলাহাবাদ প্রভৃতি হিন্দু প্রধান এলাকায় গোরক্ষাকে উদ্দেশ্য করে একাধিক আন্দোলন শুরু হয়। বিশেষ করে বকর-ঈদ উপলক্ষে মুসলমানদের গো-কোরবানির বন্ধের উদ্দেশ্যে হিন্দু সমাজের এই আন্দোলন অচিরেই দাঙ্গার রূপ নেয়। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বিহার ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশের বিভিন্ন জায়গায় ৩১টি দাঙ্গা হয়। সূত্র: শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, *পলাশি থেকে পার্টিশান ও তারপর, প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৮।

ধরেছিলেন, শিক্ষিত ও সহনশীল ব্যক্তিবর্গ। এদের মধ্যে অন্যতম হলেন, মীর মশাররফ হোসেন। গো মাংসকে কেন্দ্র করে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে হানাহানির পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, তার মীমাংসা স্বরূপ মুসলমান সমাজকে গো-মাংস খাওয়া থেকে বিরত থাকার আহবান জানিয়েছিলেন। 'আহমদী' (১ম সংখ্যা, ১২৯৫ বঙ্গাব্দ) পত্রিকায় 'গোকুল নির্মূল আশঙ্কা' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। সেখানে তিনি বলেন—

> "... ভাই! গোজাতি মরিয়াও আমাদের উপকার সাধন করিতেছে। আহা! প্রথমে দুগ্ধ দিয়া প্রাণ বাঁচাইল, পরে শরীর খাটাইয়া তোমার সংসার চালাইল, মরিয়াও তোমার সহস্র উপকার করিল – গায়ের চামড়া দিয়া তোমার পদসেবা করিল।"[৬]

তিনি একদিকে যেমন গো হত্যাকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় বাতলেছেন, তেমনই অন্যদিকে আমাদের কৃষিপ্রধান দেশের অর্থনীতিতে গরুর উপকারিতার কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু, মশাররফ হোসেন যতই অর্থনৈতিক ফায়দার কথা বলতে চান না কেন, রক্ষণশীল মুসলমান সমাজের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাননি। তাঁর বিরুদ্ধে এই আক্রমণের মাত্রা বেশ জোরালো ছিল। গো-মাংস ভক্ষণের ফলে গো-নির্মূলের যে আশঙ্কা তিনি করেছিলেন, তা নাকোচ করে 'আখবারে এসলামিয়া' পত্রিকা, 'গোকুল নির্মূল আশঙ্কা প্রবন্ধের প্রতিবাদ' ('প্রিয় বন্ধু' নামে প্রকাশিত) প্রকাশ করেন। সেখানে বলা হয়, ভারতে গো-মাংস খাওয়া সত্ত্বেও অন্যান্য গৃহপালিত জন্তুর তুলনায় যথেষ্ট পরিমাণে গরু পাওয়া যায়। ফলে 'গো-নির্মূল আশঙ্কা' করে মীর মশাররফ হোসেনের যে বক্তব্য ছিল তা নাকোচ করা যায় বলেই উল্লেখ করা হয়।[৭]

উনিশ শতকে গো-মাংস ভক্ষণ বনাম গো-রক্ষাকে কেন্দ্র করে যে তরজা শুরু হয়েছিল, তার ধারা পরবর্তীকালেও অব্যাহত থাকে। বিশ শতকের পত্রিকাগুলিতে গো-হত্যা, গো-কোরবানী সংক্রান্ত একাধিক রচনা প্রকাশিত হয়েছে। হিন্দু পুরাণ ও ধর্মগ্রন্থ থেকে গো-বধ এবং গো-মাংস ভক্ষণের দৃষ্টান্ত তুলেও প্রতিবাদ করে, 'বাসনা' (২য় সংখ্যা, ২য় ভাগ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬) পত্রিকায় 'জীবহত্যা ও কোরবানী' শীর্ষক নিবন্ধে শেখ রেয়াজুদ্দীন আহমদ লেখেন, -

> "পূর্ব্বে গো মেধ যজ্ঞ হইত। মহর্ষি ব্যাস প্রণীত মহাভারতে দেখা যায় গো মেধ যজ্ঞ হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বীদের স্বর্গপ্রাপ্তির একটি সহজ পথ।"[৮]

[৬] মীর মোশাররফ হোসেন, 'গোকুল নির্মূল আশঙ্কা', *আহমদী* (পত্রিকা), আবদুল হামিদ খান ইউসফজয়ী (সম্পা.), ১ম সংখ্যা, ১২৯৫। সূত্র: মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ২০০১, পৃ. ২১৫।

[৭] একটি প্রিয় বন্ধু, 'গোকুল নির্মূল আশঙ্কা প্রবন্ধের প্রতিবাদ', *'আখবারে এসলামিয়া'* (পত্রিকা), মোহাম্মদ নইমউদ্দীন (সম্পা.), ১ম ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ ১২৯৫। সূত্র: মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ২০০১, পৃ. ২১৫।

[৮] শেখ ফজলল করিম, 'জীবহত্যা ও কোরবানী', *বাসনা* (পত্রিকা), শেখ ফজলল করিম (সম্পা.), জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬।

প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যে গো-মাংস খাওয়ার এই নিদর্শন এনে, লেখক যে মতকে খণ্ডন করতে চেয়েছেন, তা স্থায়ী সমাধান দিতে পারেনি। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা তাণ্ডব, আসলে কোনো নিয়ম বা ঐতিহ্যকে মেনে হয় না। আবার দেশের অর্থনীতির কথা স্মরণ করে গো-মাংস খাওয়া থেকে বিরত থাকার কথা বলা হলেও সমালোচনা এবং ব্যক্তিগত আক্রমণের শিকার হতে হয়েছে।[৯]

গোমাংস ভক্ষণ, গো-কোরবানি ইত্যাদি ঘটনার পাশাপাশি, মসজিদের সামনে বাজনা বাজানোকে কেন্দ্র করে কলকাতায় ঘটে যাওয়া দাঙ্গা মানুষের সুপ্ত হিংস্রতাকে টেনে বের করেছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসের ২ থেকে ১৫ তারিখের মধ্যে কলকাতায় দাঙ্গার ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সরকারি রিপোর্টে (Home Political) দাঙ্গার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে—

> "plying music outside the Mosque, at the time of public worship, by the Arya Samajist".[১০]

১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ২ এপ্রিল আসরের নামাজের[১১] সময়, আর্যসমাজীদের একটি মিছিল, বাজনাসহ সৈয়দ সালেহ লেনের মোড়ে অবস্থিত দিনু চামড়াওয়ালার মসজিদের সামনে দিয়ে যাত্রা করে। মসজিদের নামাজীরা বাধা দিতে গেলে দাঙ্গার ঘটনা ঘটে।

১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ২ এপ্রিল আর্যসমাজীরা নিরস্ত্র মুসলমানদের ওপর সশস্ত্র হামলা চালিয়েছিল বলেই মুসলমান সমাজের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়। আর্যসমাজীদের বিরুদ্ধে আনা এই অভিযোগের ভিত্তিতেই মুসলমান পত্রিকাগুলিতে আক্রমণাত্মক লেখালিখি প্রকাশিত হতে থাকে। প্রার্থনায় আসা নিরস্ত্র মানুষের উপর আক্রমণ, মুসলমান ব্যবসায়ীর দোকান জ্বালিয়ে দেওয়া, স্থানীয় মুসলমান অধিবাসীদের উপর শারীরিক অত্যাচার—ইত্যাদি একাধিক অভিযোগের পাশাপাশি সরকার বা পুলিশের নিষ্ক্রিয় ভূমিকার কথা উল্লেখ করে 'মোহাম্মদী', 'আহমদী' ইত্যাদি পত্রিকায় লেখালিখি প্রকাশ হতে থাকে। এক্ষেত্রে 'আহমদী' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি রচনার উল্লেখ করা হয়েছে—

> "হাঙ্গামার কারণ কী? হিন্দু মোছলমান সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন, রাজদ্রোহ ও সাম্প্রদায়িক কলহ সৃষ্টির অবতার, ঊনবিংশ শতাব্দীর 'মহর্ষি' স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর উপযুক্ত শিষ্যগণের একাগ্র অধ্যবসায় ও কঠোর সাধনার ফলে শান্তিপ্রিয় বাঙ্গালার বউকে হিন্দু মোছলমান হাঙ্গামার আগুন

[৯] ১২৯৫ বঙ্গাব্দে 'আহমদী' পত্রিকায় মীর মোশাররফ হোসেনের 'গোকুল নির্মূল আশঙ্কা' প্রকাশিত হলে, 'আখবারে এসলামিয়া' পত্রিকার ৫ম ভাগ ৪র্থ সংখ্যায় তিনটি প্রতিবাদ পত্র প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে একটিতে বলা হয় মোশাররফ হোসেন 'মুসলমান নহেন'। সূত্র: আনিসুজ্জামান, *মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৬৯, পৃ. ৫।

[১০] 'Report on The first period of the Calcutta riots from 2nd to 15th April 1926', File No. 174/26 (1-4). Home Political Branch.

[১১] আসরের নামাজ: মুসলমানদের পাঁচটি অবশ্য করণীয় কর্তব্যের (কলেমা, নামাজ, রোজা, জাকাত, হজ্ব) অন্যতম হল দিনে পাঁচ বার নামাজ পড়া। নামাজের নামকরণ এবং সময় সূচি হল– ফজর>ভোর; জোহর>দুপুর; আসর>বিকেল; মাগরিব>সন্ধ্যা এবং এসা>রাত্রি।

> জ্বালিয়াছে। ধন্য স্বামীজির শিক্ষা! ধন্য আর্য-সমাজের চেষ্টা!! পাঞ্জাব হইতে বিহার পর্য্যন্ত জ্বালাইয়া পোড়াইয়া অবশেষে সোনার বাঙ্গালাকেও শ্মশান করিবার যোগাড় করিয়াছে। তোমার কাল-চেষ্টায় এক বৎসরের মধ্যেই উপর্য্যুপরি খিদিরপুর, শ্রীরামপুর, হাওড়া ও কলিকাতায় হাঙ্গামা ঘটিয়া কত মাতাকে পুত্রহারা করিল, কত নারী অকালে স্বামীসুখে বঞ্চিত হইল, কত বালক বালিকা অনাথ হইল। হায় ঋষি দয়ানন্দ সরস্বতী!"[১২]

সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতার পাশাপাশি সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রেও বিদ্বেষী মনোভাব লক্ষ করা যায়। বিশেষত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *'রাজসিংহ'* (১৮৮২) উপন্যাসকে কেন্দ্র করে অসন্তোষের মাত্রা চড়েছে বিভিন্ন সময়ে। ইমদাদুল হক, 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'হিন্দু-মুসলমান ও বঙ্গসাহিত্য' প্রবন্ধে লেখেন -

> "অধুনাতন বঙ্গসাহিত্যের নামোল্লেখ করিতে গেলে স্বনামখ্যাত স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রের নাম সর্ব্বাগ্রে স্মৃতিপথে উদিত হয়। দুঃখের বিষয় তাঁহারই গ্রন্থাবলীর অধিকাংশ হইতে মুসলমান বিদ্বেষ অতি পরিষ্কার রূপে প্রতিফলিত হইতেছে। ইঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ "রাজসিংহ" খানি যেন বিশেষ করিয়া মুসলমানকেই অপদস্থ করিবার জন্য, মুসলমানের অন্তঃকরণে শেল বিদ্ধ করিবার জন্য লিখিত হইয়াছিল। গ্রন্থখানির প্রতি পৃষ্ঠা মুসলমান-বিদ্বেষ-বিষে পরিপূর্ণ।"[১৩]

তবে প্রাবন্ধিক কেবল বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা করেই ক্ষান্ত হননি। তিনি নবীনচন্দ্র সেনের *'পলাশীর যুদ্ধ'* (১৮৭৫) বইতে সিরাজ চিত্রের অবমূল্যায়ন সম্পর্কেও আপত্তি জানিয়েছেন। এই একই প্রবন্ধে তিনি বলেছেন -

> "সুকবি নবীনবাবু "পলাশীর যুদ্ধে" অষ্টাদশ বর্ষীয় বালক সিরাজের চরিত্রে দুর্ব্বহভার কলঙ্ক পরম্পরা অর্পণ করিয়া সাহিত্য জগতে "নাম" করিয়াছেন।"[১৪]

প্রাবন্ধিক, বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের প্রতিও অভিযোগের তীর ছুঁড়েছেন। 'ভারতী' (কার্ত্তিক, ১৩০৭ সংখ্যা) পত্রিকায় সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী সাহেব প্রণীত 'The Vernacular Education in Bengal' এর সমালোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মুসলমান সমাজকে অপদস্থ করেছেন বলে ইমদাদুল হক অভিযোগ করেছেন। তাঁর মতে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের মিলনাকাঙ্ক্ষা নেই।[১৫]

[১২] মহম্মদ আবদুল হাফিজ, 'কলিকাতায় হাঙ্গামা', *আহমদী* (পত্রিকা), গোলাম ছামদানি (সম্পা.), চৈত্র ১৩৩২।

[১৩] ইমদাদুল হক, 'হিন্দু-মুসলমান ও বঙ্গসাহিত্য', *ভারতী* (পত্রিকা), সরলা দেবী (সম্পা.), পূর্ব্বার্দ্ধ ১৩১০।

[১৪] ইমদাদুল হক, 'হিন্দু-মুসলমান ও বঙ্গসাহিত্য', *প্রাগুক্ত*।

[১৫] "বিগত ১৩০৭ খ্রিস্টাব্দের কার্ত্তিক মাসের 'ভারতীতে' শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় শ্রীযুক্ত সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী সাহেবের 'The Vernacular Education in Bengal' নামক পুস্তকাকারে প্রকাশিত বক্তৃতার সুযোগ্য সমালোচনা করিয়াছেন ... কিন্তু তিনি (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) সাহিত্যে ব্যক্তিগত বিদ্বেষের গুরুত্ব লাঘব করিতে গিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হিন্দুর মুসলমান

ভাষা সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব নিরসনের কিছু দৃষ্টান্তও পত্রিকাগুলির ধর্মচর্চাকে আলাদা মাত্রা দিয়েছিল। হিন্দু-মুসলমানের ভাষা ব্যবহার সংক্রান্ত সমস্যাকে কেন্দ্র করে শামসুদ্দিন আহমদ 'আল-এসলাম' (মাঘ ১৩৩২ সংখ্যা) পত্রিকায় 'আমাদের সাহিত্য' শিরোনামে একটি নিবন্ধ লেখেন। সেখানে তিনি উল্লেখ করেন--

> "হিন্দু লেখকগণ অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারে ভাষাকে মুসলমানদিগের নিকট দুর্ব্বোধ্য করিয়া তুলিয়াছেন। এজন্য গত বৎসর বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতিগত আলোচনা করিয়া মাননীয় নবাব সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী খান বাহাদুর সাহেব ভাষাকে সংস্কৃতের হাত হইতে মুক্ত করিয়া সোজা পথে চালাইতে বলিয়াছেন এবং যাহা চলিয়া গিয়াছে এইরূপ আরবি, পারসি, সংস্কৃত, ইংরাজী প্রভৃতি শব্দ ভাষায় অবস্থান করিতে দিতে বলিয়াছেন। অনেক নাক সিটকাইতেছেন; বলিতেছেন যে ভাষা রসাতলে যাইবে, কারণ তাঁহাদের মতে ভাষাতে সংস্কৃত ব্যতীত অন্য ভাষার শব্দের প্রবেশাধিকার নাই। প্রবেশাধিকার দিলে ভাষার বিশুদ্ধতা নষ্ট হইবে।"[১১]

তৎসম শব্দ বহুল 'পণ্ডিতি' বাংলা ভাষা বনাম আরবি-ফারসি সম্বলিত প্রচলিত বাংলা ভাষার এই দ্বন্দ্বের সমাধান স্বরূপ হামেদ আলী 'বাসনা' (বৈশাখ, ১৩১৬) পত্রিকায় 'উত্তর বঙ্গের মুসলমান সাহিত্য' প্রবন্ধে বলেন—

> "সাধু বাঙ্গালা তাহার মূল ভিত্তিস্বরূপ থাকিবে, তদুপরি বাঙ্গালা উপকরণ ও অলঙ্কারাদির সঙ্গে আরবি ও পারসি শব্দ মিশ্রিত করিয়া অপূর্ব্ব ভাষাসৌধ নির্ম্মিত হইবে। ... এই সকল শব্দ (জমাখরচ, খাজনা, কাগজ, কলম, সেরেস্তা, গোয়েন্দা) সাহিত্যে ব্যবহৃত হইলে বাঙ্গালা ভাষার সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইবে।"[১৭]

পত্রিকাগুলিতে বিভিন্ন পর্যায়ে বিরোধিতার নানা মাত্রা প্রকাশিত হলেও সচেতন এবং সহানুভূতিশীল মানুষ সম্প্রীতি ও সহাবস্থানের পথটিকেই বেছে নিয়েছিলেন। আর সম্প্রীতি প্রচারের নানা মাত্রার ধারায় ভাষা সংস্থানের মিলনটিকেই এক্ষেত্রে প্রথমে আলোচনা করব। বাঙালি মুসলমানের ভাষা নিয়ে তৈরি হওয়া সংকটের প্রেক্ষিতে পত্রিকাগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। উনিশ বিশ শতকে প্রকাশিত পত্রিকার সম্ভার অবশ্যই বাংলা ভাষার প্রতি মুসলমান সমাজের পক্ষপাতিত্বের দিকটিকেই তুলে ধরে। তবে সেক্ষেত্রেও সূক্ষ্ম ফারাকের দিকটি অবশ্যই উল্লেখ্য। সম্প্রীতি প্রচার সংক্রান্ত আলোচনায় এখানে

বিদ্বেষের বেলায় খাটে কিনা তদ্বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। ... প্রবন্ধের উপসংহার কালে রবিবাবু মুসলমান সুলেখকবৃন্দ হইতে যে ক্ষোভের প্রতীক্ষা করিয়াছেন, দুঃখের বিষয়। তাহা আমাদের নিকট বিরোধমূলক বলিয়া বোধ হইতেছে।" সূত্র: ইমদাদুল হক, 'হিন্দু-মুসলমান ও বঙ্গসাহিত্য', *ভারতী* (পত্রিকা), সরলা দেবী (সম্পা.), পূর্ব্বার্দ্ধ ১৩১০।

[১১] শামসুদ্দিন আহমদ, 'আমাদের সাহিত্য', *আল-এসলাম* (পত্রিকা), মোহাম্মদ আকরম খাঁ (সম্পা.), মাঘ ১৩২২।

[১৭] হামেদ আলী, 'উত্তর বঙ্গের মুসলমান সাহিত্য', *বাসনা* (পত্রিকা), সেখ ফজলল করিম (সম্পা.), বৈশাখ ১৩১৬।

মাতৃভাষার প্রতি আবেগের দিকটিকেই উল্লেখ করা হবে। এ প্রসঙ্গে, মোজাফফর আহমদ প্রণিত 'উর্দ্দুভাষা ও বঙ্গীয় মুসলমান' প্রবন্ধটি প্রণিধানযোগ্য। এই প্রবন্ধে তিনি লেখেন—

> "কতিপয় অ-বাঙ্গালী মোসলমান কার্য্য ব্যপদেশে কলিকাতা শহরে বাস করেন। অনেকে স্থায়ী অধিবাসীও হইয়া গিয়াছেন। ইঁহারা ইঁহাদের মাতৃভাষা উর্দ্দুর উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছেন। সে'টা বড় শ্লাঘার কথা। ... কিন্তু উর্দ্দুভাষীরা যে বাংলা দেশের মোসলমানদিগের মধ্যে বাংলার পরিবর্ত্তে উর্দ্দুভাষা চালাইবার চেষ্টা করেন এটাই তাঁহাদের বড় অন্যায়, - অনধিকার চর্চাও বটে। ... ফল কথা, বাঙ্গালা দেশে আমরা উর্দ্দুকে কখনও প্রশ্রয় দিতে পারি না। সখ করিয়া যিনি শিখিতে চান, শিখুন, কিন্তু উর্দ্দু এদেশের জন্য প্রয়োজনীয় ভাষা নহে।"[১৮]

মুসলমান সমাজে মাতৃভাষার সঙ্গে ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার দিকটিও পত্রিকার পাতায় গুরুত্ব পেয়েছে। কারণ সামগ্রিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা দ্বারাই আসলে জাতির সার্বিক উন্নতি সাধিত হয়। সেক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন। ইংরেজি ভাষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ 'ভারতের সাধারণ ভাষা' প্রবন্ধে বলেন -

> "এখন হইতে বহুদিন পর্য্যন্ত ইংরাজী আমাদের অপরিহার্য্য থাকিবে। ইউরোপের জ্ঞান বিজ্ঞান আমাদিগকে ইংরাজীর মধ্য দিয়া শিখিতে হইবে। ... ধীরভাবে চিন্তা করিলে আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, আমরা ইংরাজী বর্জ্জন করিতে পারি না। ছাত্রের পক্ষে শিক্ষা বর্জ্জনের ন্যায় তাহা আমাদের সর্ব্বনাশের কারণ হইবে।"[১৯]

মুসলমান সম্পাদিত পত্রিকায় শিক্ষিত বাঙালি মুসলমান সমকালের সঙ্কটময় পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পত্রিকার পাতায় মিলন প্রচারের যে পথ খুঁজতে চেয়েছিলেন, ভাষা সংক্রান্ত বিষয়গুলি সেক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে হয়। তবে অন্যান্য ক্ষেত্রেও হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতির ভাবনা প্রকাশিত হয়েছিল। ঔপনিবেশিক সরকারের কূটনীতির ফলেই যে ভারতবর্ষের দুই প্রধান ধর্মাবলম্বীর মধ্যে বিরোধিতার সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল, তা অনুধাবন করেই 'কোহিনূর' পত্রিকা প্রকাশ করে -

> "হিন্দু ও মুসলমান দুই প্রধান জাতিকে শাসনাধীনে রাখিবার নিমিত্ত ইংরাজকে ভেদনীতির অনুসরণ করিতে হইল। Divide and rule এই রাজনীতি মূলমন্ত্র জ্ঞান করিয়া ইংরাজ দেশ শাসন করিতে লাগিল। ইহার ফলে ইংরাজগণ হিন্দুর মনে মুসলমান বিদ্বেষানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া তুলিল।"[২০]

---

[১৮] মোজাফফর আহমদ, 'উর্দ্দুভাষা ও বঙ্গীয় মুসলমান', *আল-এসলাম* (পত্রিকা), মোহাম্মদ আকরম খাঁ (সম্পা.), শ্রাবণ ১৩২৪।

[১৯] মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, 'ভারতের সাধারণ ভাষা', *মোসলেম ভারত* (পত্রিকা), মোজাম্মেল হক (সম্পা.), বৈশাখ ১৩২৭।

[২০] ওমর আলী, 'হিন্দু মুসলমানের বিরোধের কারণ ও তন্নিবারণের উপায়', *কোহিনূর* (পত্রিকা), রওশন আলী চৌধুরী (সম্পা.), মাঘ-ফাল্গুন ১৩১৩।

শাসকের বিভেদনীতির ফাঁদে পা না দিয়ে ভারতবর্ষীয় হিন্দু-মুসলমানগণ নিজেদের মধ্যে সদ্ভাব বজায় রাখলে সত্যিই যে একদিন জগৎ সংসারে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এই মহান কার্যকে বাস্তবে পরিণত করতে হলে একে অন্যের বিষয়ে সম্যক উপলব্ধির প্রয়োজন। ধর্মের পরিভাষা ভিন্ন হলেও বা ধর্ম কেন্দ্রিক আচার আলাদা হলেও বাঙালি সংস্কৃতির টানে উভয়ের মধ্যকার মিলন অবশ্যম্ভাবী বলেই মনে হয়। তাই মুহম্মদ শহীদুল্লাহ যখন লেখেন—

> "আমি বিশ্বাস করি কল্‌চরের মধ্য দিয়াই আমাদের মিলন হইবে। যে পর্যন্ত মুসলমান হিন্দু কল্‌চর সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিবে এবং হিন্দু মুসলমান কল্‌চর সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিবে, সে পর্যন্ত কখনই আন্তরিক মিল হইবে না।"[১১]

তিনি বাঙালি তথা ভারতবর্ষের সর্বকালের কাঙ্ক্ষিত মিলনের পথকেই নির্দেশ করেছেন। বর্তমান ভারতবর্ষের বুকেও যে অসহিষ্ণুতা দানা বাঁধতে শুরু করেছে তা নিবারণেও প্রায় শতবর্ষ পুরানো এই আর্তি আজও প্রাসঙ্গিক। আসলে ঔপনিবেশিক শাসনকালে যে বিভেদ নীতির জন্ম হয়েছিল, তাকে রসদ করে আজও স্বার্থান্বেষী কুটিল রাজনীতিকেরা হিংসার প্রয়োগ করে চলেছে। বিশ শতকের মুসলমান সম্পাদিত পত্রিকাগুলি বিভিন্ন সময়ে রাজনীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। মুসলমান সমাজের সার্বিক কল্যাণে কখনও বা শাসকের কূটনৈতিক ফাঁদে পাও দিয়েছিল। কিন্তু মিলন ও সম্প্রীতির প্রয়োজনকে উপলব্ধি করেছিলেন অনেকেই। পত্রিকাগুলি কখনও নিজেদের অন্দরের সংকীর্ণতাকে দূর করে, কখনও প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক পরিচয় লাভ করে, আবার কখনও বা নিজেদের ধর্ম-সংস্কৃতির প্রকাশের দ্বারা সেই মিলনকে আনতে চেয়েছিলেন। তাই শতবর্ষ পরেও পত্রিকাগুলি আজও সম্প্রীতির বার্তায় আলো দেখিয়ে চলেছে। বর্তমান প্রজন্মের কাছে সেগুলি আজও শিক্ষণীয়।

---

[১১] মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, 'দশের কথা', *ছোলতান* (পত্রিকা), মোহাম্মদ মনিরজ্জামান ইসলামাবাদী (সম্পা.), মে ১৯২৩।